বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

৩.৪. অহিংসা সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণা
Gandhiji's conception of Non-violence

অহিংসামন্ত্রের জন্মভূমি হল ভারতবর্ষ। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর এবং বৌদ্ধ নীতি-নিষ্ঠধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেব জীবনের পরমার্থ মুক্তি বা নির্বাণ লাভের জন্য মানুষকে অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত হতে বলেছেন। এঁদের মতে, কায়মনোবাক্যে কোন জীবের অনিষ্ট না-করা, এমনকি অনিষ্টের চিন্তা না-করাই অহিংসা। নিজে হিংসা করা, অপরকে হিংসায় প্রণোদিত করা, অপরের হিংসাত্মক কর্ম সমর্থন করা—এসবই হিংসার অন্তর্গত। নিজে হিংসা করা যেমন দোষের, অপরকে হিংসায় প্ররোচিত করাও তেমনি দোষের, তেমনি আবার অপরের হিংসাত্মক কর্মকে সমর্থন করা সমান দোষে দুষ্ট। প্রাচীনকালে, মৃগয়া বা বন্যপশু শিকার রাজাদের একটি ব্যয়বহুল ব্যসন ছিল। রাজা যখন শিকারে যান তখন তাঁর দেহরক্ষীরূপে বহুসংখ্যক পার্শ্বচর থাকে, বনাঞ্চলে রাত্রিবাসযোগ্য তাঁবু নির্মাণের জন্য কর্মচারী থাকে, মুখরোচক অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করার জন্য পাচক-পাচিকা থাকে। এখানে রাজা প্রত্যক্ষভাবে হিংসার পথ অবলম্বন করেন, অপরাপর সকলের কাছে পথটি হল পরোক্ষ। অহিংস হতে গেলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় পথই বর্জনীয়। কেননা প্রথম ক্ষেত্রে কুকর্ম এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কুচিন্তা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকে। পরিপূর্ণ অহিংস-ব্রত উদ্‌যাপন করতে হলে এজাতীয় কুকর্ম ও কুচিন্তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

আবার, এঁদের মতে, অহিংসার কেবল নেতিমূলক দিকই নেই, ইতিমূলক দিকও আছে। কেবল অপরের ক্ষতি না করাটাই অহিংসা নয়, সর্বজীবে প্রেম বিতরণ এবং হিতকর কর্মানুষ্ঠানও অহিংসার অন্তর্গত। সর্বজীবে প্রেম ও ভালবাসা বিতরণের মাধ্যমে এবং কল্যাণকর্ম সাধনের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের পরিপূর্ণতা লাভের বাসনা চরিতার্থতা লাভ করতে পারে— জৈন ও বৌদ্ধ, এই দুটি মানবতা ধর্মে এই কথাই ঘোষণা করা হয়েছে।

অন্যূন প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবদরদী গান্ধীজিও অনুরূপভাবে মানুষকে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হতে বলেছেন,—অহিংসা, মৈত্রী ও প্রেম-ভালবাসার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কল্যাণকর্ম করতে বলেছেন। প্রাচীন অহিংসা-মন্ত্রের সঙ্গে গান্ধীজির অহিংসা-মন্ত্রের মূল পার্থক্য একটাই এবং সেখানেই তাঁর অভিমতের স্বকীয়তা ও অভিনবত্ব। প্রাচীন জৈন ও বুদ্ধমতে, জীবের (মানুষের) পরমার্থ মুক্তি বা নির্বাণলাভের মার্গ (পথ) হল অহিংসা পথ। গান্ধীজি সমাজকল্যাণ সাধনকেই মানুষের পরমার্থরূপে গণ্য করে বলেছেন যে, অহিংসা পথেই কেবল ঐ অভীষ্ট লাভ করতে হবে— হিংসার পথ ধরে সমাজের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে না। অর্থাৎ, ব্যক্তি-মানুষের পরমার্থিক মোক্ষ বা মুক্তিলাভের পথ-হিসাবে নয়, বাস্তব সমাজের, সমাজস্থ সব মানুষের মোক্ষ বা মুক্তিলাভের হিসাবে নয়, বাস্তব সমাজের, সমাজস্থ সব মানুষের সার্বিক কল্যাণ (সর্বোদয়) সাধনের জন্যই গান্ধীজি অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে অপরকেও ঐ পথ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। আরও সহজভাবে বলা যায়— প্রাচীন মত অনুসরণ করে গান্ধীজি অহিংসা-পথকে ব্যক্তি-কর্মকেন্দ্রিক বলেননি, গোষ্ঠী-কর্ম কেন্দ্রিক বলেছেন—গোষ্ঠীগতভাবে প্রতিবাদের পথই হল অহিংসপথ। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের অর্থাৎ গোষ্ঠীর এই প্রতিবাদ পরাধীন দেশের বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে হতে পারে, আবার স্বাধীন দেশের স্বদেশী শাসকদের বিরুদ্ধেও হতে পারে। তবে, গান্ধীজির অভিমত হল, বিদেশী অথবা স্বদেশী নির্বিশেষে প্রতিবাদটিকে হতে হবে অহিংসার রাজপথে, হিংসার চোরাপথে নয়। গান্ধীজি অবশ্য অহিংসার মাত্রাভেদ স্বীকার ক'রে এমনও বলেছেন যে, ক্ষেত্রবিশেষে পথটি উগ্র অথবা কোমল হতে পারে। বিদেশী শাসকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে পথটি উগ্র হতে পারে, যদিও স্বদেশী শাসকদের দুর্নীতির প্রতিবাদে পথটিকে হতে হবে নম্র।

গান্ধীজি-সম্মত অহিংসাপথ অবলম্বন সুকর নয়, দুষ্কর, কেননা তা ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠার পথ, সত্যাগ্রহের পথ। সত্যের প্রতি অবিচল আগ্রহ না থাকলে এই পথ অবলম্বন করা যায় না। এই পথ তাই কাপুরুষ ও চরিত্রহীনের সশস্ত্র পথ নয়, এই পথ নির্ভীক ও চরিত্রবানের নিরস্ত্র পথ। নির্ভীক ও চরিত্র বলে বলীয়ানই কেবল তার ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠাকে হাতিয়ার করে অত্যাচারী সশস্ত্র কাপুরুষের সম্মুখীন হতে পারে এবং প্রয়োজন হলে অকুতোভয়ে ও অবিচলিত চিত্তে আত্মোৎসর্গ করতে পারে। অহিংসা-যুদ্ধ এক ধর্মযুদ্ধ, সত্যধর্মে বলীয়ান হয়ে যুদ্ধ। এই যুদ্ধের যে অনুশাসন, 'মরব তবু মারব না, এবং এই করেই জয়ী হব—এ একটা মস্ত বড় কথা, একটা বাণী। এটা চাতুরী কিংবা কার্যোদ্ধারের বৈষয়িক পরামর্শ নয়। ধর্মযুদ্ধ বাইরে জেতবার জন্য নয়, হেরে গিয়েও জয় করার জন্য। অধর্ম যুদ্ধে মরাটা মরা। ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে, হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত'।[১]

গান্ধীজি বিশ্বাস করেন যে সশস্ত্র হিংসার পথে শত্রুকে জয় করা যায় না, কেবল দমিত করা যায়। দমন-পীড়নে হিংসার নিবৃত্তি হয় না, বরং তা বৃদ্ধি পায়। অহিংসা পথের আবেদন প্রতিপক্ষের পশু-প্রকৃতির কাছে নয়, তা হল মানবতার কাছে, বিবেকবুদ্ধির কাছে। অহিংসা-পথে প্রতিপক্ষের বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করা হয়, তার অন্তরকে কলুষমুক্ত করা হয় এবং পরিণামে প্রতিপক্ষের অন্তরে বৈরীভাব অন্তর্হিত হলে উভয়পক্ষ প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ প্রকার অহিংসা পথেই কেবল প্রতিপক্ষীয়দের অন্তরশুদ্ধি ঘটিয়ে তাদের ন্যায় ও সত্যের পথে চালিত ক'রে সমাজের সার্বিক কল্যাণসাধন সম্ভব হয় অর্থাৎ সর্বোদয় প্রতিষ্ঠা পায়, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে, ক্ষেত্রবিশেষে গান্ধীজি অহিংসা পথেও অস্ত্র ব্যবহারকে প্রয়োজনীয় বলেছেন, যেখানে অস্ত্রের ব্যবহার অহিংসার বিশুদ্ধতাকে বিনষ্ট করে না। অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির লক্ষ্য যদি হয় সত্য ও ন্যায়ের রক্ষা এবং

১. মহাত্মা গান্ধী — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ। একাদশ খণ্ড। পৃ.-৪৫১।

প্রতিপক্ষ, তাহলে চোখের সামনে তাদের পদদলিত হতে দেখলে সত্যাগ্রহীকেও অস্ত্রধারণ করতে হয়। কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে কেউ নির্মমভাবে আঘাত করছে, এমন দেখলে, — কোন স্ত্রীলোকের সম্মানহানি করতে কেউ উদ্যত হয়েছে, এমন দেখলে,—কোন ব্যক্তিকে কোন ঘাতক হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, এমন দেখলে, অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত সত্যাগ্রহীরও অস্ত্রধারণের প্রয়োজন হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অহিংসাব্রতী গান্ধীজি, ক্ষেত্রবিশেষে জীবহত্যাকেও উচিতকর্ম বলেছেন। অনারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবন যেখানে নিরন্তর অসহ্য ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত, যন্ত্রণা-উপশমের কোন সম্ভাবনা যেখানে নেই, সেখানে অহিংসাব্রতীর উচিত কাজ হবে তাকে হত্যা করা। এমন ব্যথা-বেদনা জর্জরিত একটি কুকুরের প্রাণনাশের জন্য গান্ধীজি নিজেই তাঁর অনুচরবৃন্দকে নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, গান্ধীজি এমনকি করুণা হত্যা বা সদয় হত্যাকে (euthanasia-কে) সমর্থন করার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

গান্ধীজির মতে, **'সর্বোদয়' সমাজের আদর্শ, আর ঐ আদর্শ লাভের উপায় হল অহিংস-অস্ত্র— সত্যাগ্রহ।** অহিংস-অস্ত্র সত্যাগ্রহ, **গান্ধীজির মতে, কল্যাণ-বিধায়ক নৈতিক-অস্ত্র— অস্ত্রহীন সত্যনিষ্ঠ বীরের অস্ত্র।** এই সত্যাগ্রহ বা অহিংস-পথের দুটি প্রকার আছে—**আক্রমণাত্মক উগ্র পথ এবং শোধনাত্মক সৌম্য পথ।** ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে, ইংরেজ শাসনের অবসানের জন্য, গান্ধীজি অহিংসার উগ্র পথটিকে গ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনে অথবা লবণ আন্দোলনে আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রয়োজনীয় হওয়ায় গান্ধীজি সেক্ষেত্রে অহিংসার উগ্র পথটিকে অবলম্বন করেন। এ প্রসঙ্গে গান্ধীজির আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী ও ভূদানযজ্ঞের প্রবর্তক আচার্য বিনোবা ভাবে বলেন, 'স্বাধীনতা লাভের জন্য যে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহা ছিল চাপ প্রয়োগ করিয়া ইংরেজদের রাজশক্তি ধ্বংস করিবার নেগেটিভ (নিষেধাত্মক বা আক্রমণাত্মক) পথ[১]। ইংরেজের নাগপাশ ছিন্ন করে যথাসম্ভব শীঘ্র স্বাধীনতা লাভ করা প্রয়োজন ....এই অবস্থায় সত্যাগ্রহের (অহিংস পথের) ঐ উগ্র ও নিষেধাত্মক প্রক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছিল।'[২]

কিন্তু স্বাধীনতার **পরবর্তীকালে সত্যাগ্রহ বা অহিংস-অস্ত্র নিষ্প্রয়োজনীয়।** 'গান্ধীজি ইংরেজদের বলিলেন 'ভারত ছাড়' আর তাহাদের ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইল। কিন্তু আমরা নিজেদের দেশের পুঁজিপতি বা জমির মালিকদের ঐভাবে 'ভারত ছাড়' বলিতে পারি না। সুতরাং এখন যে সত্যাগ্রহ (বা অহিংস আন্দোলন) তাহা....................নিষেধাত্মক (নেগেটিভ) হইতে পারে না'[৩] এখন প্রয়োজন শোধনাত্মক সৌম্য অহিংস পথ অনুসরণ করে দেশের পুঁজিপতি ও জমি মালিকদের হৃদয়-পরিবর্তন বা চিত্ত-সংশোধন। উগ্র অহিংস-পথের অনুশাসন হল 'মেণ্ড অর এণ্ড' (mend or end) অর্থাৎ 'হয় তুমি নিজেকে নমনীয় কর, নচেৎ নিপাত যাও', কিন্তু সৌম্য অহিংস-পথের অনুশাসন হল 'নিজেকে সংশোধন কর' (reform yourself)। স্বাধীন ভারতে **এই সৌম্য অহিংসপথকেই গান্ধীজি অনুসরণীয় বলেছেন,** যদিও তাকে কার্যকর দেখে যেতে পারেননি। 'ভারত ছাড়' অহিংস-সংগ্রামের অবসানের পর গান্ধীজি ১৮ দফা কর্মপন্থা এবং ততোধিক উপায়ে (সৌম্য অহিংস উপায়ে) জনসেবার জন্য নির্দেশ দেন। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর গান্ধীজির সভাপতিত্বে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী সেবাগ্রামে সত্যাগ্রহী লোকসেবকদের এক সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে জানুয়ারী এক আততায়ীর গুলিতে গান্ধীজির কর্মবহুল ও ঘটনাবহুল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও সংস্কার সাধনের জন্য গান্ধীজি যে সৌম্য সংশোধনাত্মক অহিংস পথের কথা বলেন, **সমাজদর্শন ও রাষ্ট্র দর্শনে গান্ধীজির সেই সৌম্য অহিংস-নীতিই মুখ্য** আলোচ্য বিষয়। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে 'হরিজন আন্দোলনে' গান্ধীজি সৌম্য অহিংস পথকে গ্রহণ করে বলেন যে, অসামাজিক মানুষের (অস্পৃশ্যজ্ঞানে মানুষকে ঘৃণা করা অসামাজিক মানুষের ন্যায়) কার্যাবলী রোধ করার জন্য, তাদের অন্তর-শোধনের দ্বারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে, বলপ্রয়োগের দ্বারা যা সম্ভব হবে না। হিংসার দ্বারা

১. ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন—চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী। পৃ. ২১২.
২. আচার্য বিনোবা ভাবের উক্তি ; ঐ পৃ. ২১৩.
৩. ঐ—পৃঃ ২১১.

সমাজের দুষ্কৃতির অবসান ঘটানো যায় না। **হিংসার দ্বারা শীঘ্র দুষ্টকে দমন করা গেলেও তা সাময়িক, পরিণামে দুষ্টতা বাড়ে।** সমাজবিরোধীকে কারাদণ্ড দিলে অথবা হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিলে সমাজবিরোধিতা বা নরহত্যা হ্রাস পায় না, বরং বৃদ্ধি পায়। দমন-পীড়নের মাধ্যমে দুষ্টের দমন সব দেশেই ব্যর্থ হয়েছে। সমাজে দুষ্কৃতির অবসান ঘটানোর জন্য গান্ধীজি তাই তাঁর বৈপ্লবিক অহিংস-পথের (সৌম্য পথের) নির্দেশ দিয়েছেন। **মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অহিংস উপায়ে দুষ্টের অন্তর শুদ্ধি করা গেলে তবেই স্থায়ীভাবে অপকর্ম রোধ করা সম্ভব হতে পারে।** এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সত্যনিষ্ঠা, চরিত্রবল এবং প্রয়োজনে আত্মদান। অহিংস-মন্ত্রে দীক্ষিত গান্ধীজি মনে করেন যে, কোন পাপীর অথবা পাপকর্মের এমন শক্তি নেই যা সত্যাগ্রহীর অহিংস-বলকে, আত্মত্যাগকে পরাভূত করতে পারে। কাজেই, **গান্ধীজির মতে, সমাজের গঠনের জন্য, সমাজের সংস্কার সাধনের জন্য, প্রকৃষ্ট উপায় হল— অহিংসার দ্বারা দুষ্টের স্বভাব পরিবর্তন ও তার চরিত্র সংশোধন।**

গান্ধীজির মতে, সমাজ-সংস্কারের **প্রথম ও প্রধান ধাপ হল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ,** কেননা দীর্ঘকাল ধরে অস্পৃশ্যতার অন্ধ-কুসংস্কার ভারতীয় সামাজিক পরিবেশকে দূষিত ও কলুষিত করেছে, মূল শূদ্র-শক্তিকে অবহেলা করে সমাজশক্তিকে নিদারুণভাবে দুর্বল করেছে। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে অথবা দর্শনে কোথাও অস্পৃশ্যতার উল্লেখ নেই— অস্পৃশ্যতা, কিছু সুযোগ-সন্ধানী কপট মানুষের সৃষ্টি। উপনিষদ বলেন, 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ 'তুমিই সেই'— তোমার মধ্যেই (অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে) আছে ঐশীশক্তি। বুদ্ধদেব বলেন, 'আত্ম দীপঃ ভবঃ' অর্থাৎ 'প্রত্যেকে অগ্নিশিখার মতো প্রজ্বলিত হয়ে ওঠো— প্রত্যেকের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে অনন্ত সূর্যশক্তি'। জৈনরা বলেন, প্রত্যেক মানুষের 'জিন্' বা সিদ্ধপুরুষ হবার সামর্থ্য আছে। স্পষ্টতই, ভারতীয় ধ্যান ধারণায় মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ স্বীকৃত হয়নি। ভারতীয় বিশুদ্ধ ধর্মদর্শন চিরকাল সমাজবদ্ধ মানুষকে একত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছে, আর অস্পৃশ্যতারূপ অধর্ম ভারতীয় সমাজকে ছিন্নভিন্ন ও দুর্বল করেছে। **যা সমাজকে সম্বদ্ধ করে তাই ধর্ম, আর সমাজকে যা খণ্ডিত করে তা অধর্ম। গান্ধীজি তাঁর অহিংসা-মন্ত্রে সমাজকে তার 'ধর্ম' পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, অস্পৃশ্যতাকে স্বীকার করে অধর্ম পালনের নির্দেশ দেননি।**

গান্ধীজি নির্দেশিত অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত হলে স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের মধ্যে, সবল-দুর্বলের মধ্যে, ধনী ও নির্ধনের মধ্যে, ভূম্যধিকারী ও ভূমিহীনদের মধ্যে, এক কথায় মানুষের সঙ্গে মানুষের, কোন বৈরী মনোভাব থাকে না— স্পৃশ্য অস্পৃশ্যকে, সবল দুর্বলকে, ধনী নির্ধনকে, ভূম্যধিকারী ভূমিহীনকে, এক কথায় মানুষমাত্রই মানুষকে, আত্মার আত্মীয়জ্ঞানে আলিঙ্গন করে। অহিংস পন্থায় এমন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠাই সর্বোদয় আদর্শ এবং এপ্রকার সমাজ ব্যবস্থাকেই গান্ধীজি 'স্বরাজ' বলেছেন, 'রামরাজ্য' বলেছেন। **অহিংস-পথে, ভারতবর্ষের বহুযুগব্যাপী অন্ধতা ও মূঢ় আচার- বিচারের অবসান ঘটিয়ে, প্রত্যেক মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাই হল গান্ধীজি সম্মত স্বরাজ প্রতিষ্ঠা বা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা।**

সমালোচনা (Criticism)

একথা ঠিক যে, হিংসার পথে, দমন-পীড়নের মাধ্যমে, দুষ্ট ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে দমিত করা গেলেও দুষ্টতার অবসান ঘটে না, সুযোগমতো দুষ্টব্যক্তি তার দুষ্টতাকে পূর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় প্রকাশ করে। অহিংস-পথেই দুষ্টের বিবেকবুদ্ধির কাছে আবেদন জানিয়ে তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো যায় এবং তার দুষ্টতারও অবসান ঘটানো সম্ভব হয়। তবে,**অহিংস-পথে এপ্রকার চরিত্র-সংশোধন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সম্ভব হতে পারে, গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নয়।** অহিংস-পথে বিশেষ কোন ভূম্যধিকারীর হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে কিছু পরিমাণ জমি ভূমিহীনদের দান করতে সম্মত করানো যায়, সমস্ত ভূম্যধিকারীর অন্তরের পরিবর্তন ঘটিয়ে ঐ কাজে সম্মত করানো সম্ভব হয় না।

তেমনি আবার, অহিংস-পথে যুদ্ধের মতো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া যায় না, কেননা অহিংস-পথে শত্রুপক্ষের প্রত্যেকের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন সম্ভব হতে পারে না। অহিংস-পথ অবলম্বন করে নিরস্ত্রভাবে সশস্ত্র শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হলে মৃত্যু অনিবার্য, এবং ঐভাবে মৃত্যুবরণে কোন গৌরব নেই। ঐভাবে মৃত্যু অপরিণামদর্শী মূর্খের মৃত্যু, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় সত্যাগ্রহীর আত্মত্যাগ নয়।

তাছাড়া, **অহিংসার আবেদন মানুষের বিবেকবুদ্ধির কাছে, তার মনুষ্যত্ববোধের কাছে, গর্দভের বিবেকসম্পন্ন নরপশুর কাছে নয়।** কিন্তু প্রত্যেক সমাজে এমন কিছু নরপশু থাকে যারা নিজেদের পশুবৃত্তিকে চরিতার্থ করার

জন্য নির্বিচারে নরহত্যা করে, পরের সম্পদ লুণ্ঠন করে, অপরের গৃহে অগ্নিসংযোগ করে, স্ত্রীলোকের ওপর বলাৎকার করে, অপরের সন্তান চুরি করে তাদের উচ্চমূল্যে বিক্রয় করে। এদের চিত্ত-সংশোধন অহিংস-পথে সম্ভব হতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে হিংসার পথ ধরে দুর্বৃত্তকে দমন-পীড়নের প্রয়োজন হয়।

গান্ধীজির **অহিংস-পথের তাই তত্ত্বগত মূল্য থাকলেও ব্যবহারিক মূল্য তেমন নেই।** সমাজের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে অহিংস পথ অকেজো। দুষ্টকে কেবলই দমন-পীড়নের মাধ্যমে যেমন ইষ্ট লাভ হয় না, তেমনি অহিংস-পথে তাকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকার আবেদন করলেও ইষ্ট লাভ হয় না। সমাজকল্যাণ সাধনের পথটি বাস্তব সমাজের প্রেক্ষিতেই নির্ধারণ করতে হবে। কাজেই, এমন বলাই সমীচীন হবে যে, সমাজকল্যাণ সাধনের পথটি হবে ক্ষেত্রবিশেষে ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli) এবং হবস্ (Hobbes) সম্মত হিংসার পথ— দমন-পীড়নের পথ, আবার ক্ষেত্রবিশেষে তা হবে গান্ধীজি সম্মত অহিংস-পথ।

৩.৫. সত্যাগ্রহ
Satyaagraha

'অহিংসা' শব্দটির মতো ' সত্যাগ্রহ' শব্দটিও গান্ধীজির মতবাদে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অহিংসা প্রসঙ্গেই গান্ধীজি 'সত্যাগ্রহ' শব্দটি প্রয়োগ করেন। **অহিংস-পথে অগ্রসর হওয়া সহজ নয়, এই পথ কেবল সত্যাগ্রহীর পথ। একনিষ্ঠভাবে সত্যের প্রতি আগ্রহ যার সেই সত্যাগ্রহী, আর অহিংস-পথে সত্যনিষ্ঠভাবে চলাটাই সত্যাগ্রহ। গান্ধীজির মতে, সত্যই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই সত্য। সত্যের উপাসনাই ঈশ্বর সাধনা।** সমাজে সত্যের প্রতিষ্ঠাই 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠা, স্বরাজ প্রতিষ্ঠা।

'সত্যাগ্রহ' গান্ধীজির মঙ্গলবিধায়ক অস্ত্র, নৈতিক অস্ত্র'।[১] গান্ধীজি এখানে ভগবদ্গীতার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে বলেছেন যে, সত্যাগ্রহের যোগ্য হবার জন্য সাধককে অর্থাৎ সত্যাগ্রহীকে **অনাসক্তিযোগী** হতে হবে। সত্যাগ্রহীর আন্দোলন শুধুমাত্র ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে ; জীবনসত্যকেই একমাত্র পথ ও পাথেয় করে, লাভ-ক্ষতির প্রতি কোনরকম আসক্তি না রেখে, সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই সত্যাগ্রহী আন্দোলনে যুক্ত হবে। সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য হবে অহিংস-পথে সমাজ সংস্কার, দীর্ঘদিন সঞ্চিত আবর্জনা ও পঙ্কিলতা অপসারিত করে দূষণমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা। **সত্যাগ্রহীকে হতে হবে সংযমী, নির্লোভী এবং কোনরকম স্বার্থচিন্তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে তাকে নিরন্তর পরহিতে, লোকসেবায় নিয়োজিত থাকতে হবে। সত্যাগ্রহী হবে কর্মযোগী, তার 'যোগ' কেবল সত্যনিষ্ঠ কর্মের সঙ্গে, কর্মফলের সঙ্গে নয়।** সত্যাগ্রহ আন্দোলন যদি কখনো ব্যর্থ হয়, তাহলে সত্যাগ্রহী তার কর্ম থেকে নিবৃত্ত হবে না,— কেননা **অশুভ ফলের দ্বারা সৎকর্মের সৎগুণ বিনষ্ট হয় না।**

অহিংস-পথের মতো সত্যাগ্রহ আন্দোলনেরও দুটি প্রকার আছে— **আক্রমণাত্মক উগ্র পথ** এবং **শোধনাত্মক** সৌম্য পথ। বিদেশী শাসক অপশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনটি হবে আক্রমণাত্মক ; স্বদেশী শাসকের অনাচার ও ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনটি হবে শোধনাত্মক। তবে, স্বদেশের অব্যবস্থার বিরুদ্ধেও সত্যাগ্রহ আন্দোলন ক্ষেত্রবিশেষে উগ্র হতে পারে— সৌম্য পথে হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন সম্ভব না হলে উগ্র পথ প্রয়োজনীয় হতে পারে। ভূম্যধিকারীগণ যাতে ভূমিহীনদের কিছু জমি দান করেন, এই উদ্দেশ্যে বিনোবাজি শোধনাত্মক সৌম্য পথে 'ভূদানযজ্ঞ-সত্যাগ্রহ' আন্দোলন করেন। এখানে সত্যাগ্রহী বিনোবাজির উদ্দেশ্য ছিল সৌম্য পথে ভূম্যধিকারীদের হৃদয় পরিবর্তনের চেষ্ট করা। এই সৌম্য পথে ভূদানযজ্ঞ সার্থক না হলে বিনোবাজি উগ্রপথ (অবশ্যই অহিংস-পথ) গ্রহণেরও নির্দেশ দিয়েছেন। গান্ধীজি নিজেও অনেক ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহের উগ্রপথটি গ্রহণ করেছেন। সৌম্য পথে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অপসারিত না হওয়ায় গান্ধীজি উগ্র পথ অবলম্বন করে **অনশনব্রত** পালন করেন ; তেমনি, হরিজন আন্দোলনে তিনি একই কারণে উগ্র পথ **অনশনব্রত** অবলম্বন করেন।

গান্ধীজি মনে করেন যে, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের শক্তি অমোঘ, যা কখনো ব্যর্থ হতে পারে না—অহিংস পথে সত্যকেই একমাত্র 'আগ্রহ' করলে অপরের হৃদয় পরিবর্তন অবশ্যই সম্ভব। গান্ধীজির বিশ্বাস, সমগ্র পৃথিবীতে

১. সর্বোদয় আন্দোলনের ইতিহাস— গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ. ৩২

এমন কোন দুর্জন থাকতে পারে না যার অন্তরকে সংশোধন করা যায় না। তবে, ঐ শুদ্ধি বা সংশোধন করতে হবে অহিংস-পথে, সেবা ও প্রেম-ভালবাসার মাধ্যমে। প্রেম-ভালবাসার মাধ্যমেই সত্যকে লাভ করা যায় এবং যা সত্য তাই ঈশ্বর। **প্রেম-ভালবাসাই মানুষের মধ্যে ঐশী শক্তি জাগ্রত করতে পারে, অন্য কিছু নয়।**

সত্যাগ্রহ-আন্দোলন নানাভাবে প্রকাশ পেতে পারে, যেমন— ধর্মঘট, অসহযোগ, ধর্ণা, অবস্থান-প্রতিবাদ, অনশন, কর্মীদের কাজে বাধাদান, আইন-অমান্য, অসঙ্গত রাজস্ব (tax) -না- দেওয়া, প্রদত্ত সম্মান বা উপাধি প্রত্যাখ্যান (যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ), কাজে যোগ না দেওয়া, বিদেশী পণ্য বর্জন, ইত্যাদি। তবে, উল্লেখযোগ্য যে, এসবের প্রতি ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ আন্দোলনটিকে অহিংস হতে হবে।

'জীবন-সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, অপরকে ঐ সত্যপথে অনুগামী করতে হলে, অহিংসা সম্পর্কে, সত্যাগ্রহ সম্পর্কে, তত্ত্বালোচনাই যথেষ্ট নয়, সর্বাগ্রে তাকে নিজ জীবনে চর্চা করতে হবে' —ভারতীয় দর্শনের এই মর্মবাণী গান্ধীজি আমৃত্যু অকপটে অনুসরণ করেছেন। ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য নিছক সত্যচর্চা নয়— সত্যচর্যাও তাতে যুক্ত হয়েছে। সত্যজ্ঞানের আলোকে নিজ আচরণকে পরিচালিত করা, **চর্চাকে চর্যার সঙ্গে যুক্ত করা,** বিচারের সঙ্গে আচারের সমন্বয় সাধন করাই হল উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের চরম লক্ষ্য। ভারতীয় দর্শনে তাই মননের (চিন্তার বা জ্ঞানের) সঙ্গে আচরণের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত জ্ঞানের কোন সমর্থন ভারতীয় দর্শনে নেই। গান্ধীজিও মনে-প্রাণে অকপটে এই পথ অনুসরণ করেছেন; নিজ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে তিনি যে জীবনসত্য উপলব্ধি করেছেন তাকে সর্বপ্রথম জীবনচর্যার মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এবং কেবল তখনই তিনি অপরাপর ব্যক্তিকে 'অহিংসামন্ত্রে' দীক্ষিত হতে বলেছেন, 'সত্যাগ্রহী' হতে বলেছেন, 'সর্বোদয় আদর্শ'কে বাস্তবায়িত করতে বলেছেন। হরিজন আন্দোলন, অনশন, বিদেশী পণ্য বর্জন, আইন অমান্য, লবণ-আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলন ইত্যাদির পুরোভাগে সক্রিয়ভাবে অবস্থান করে তিনি সেসবের নেতৃত্ব দিয়েছেন— আত্মরক্ষার চাতুরীতে পশ্চাদবর্তী হয়ে নয়। 'আপনি আচারি ধর্ম (কর্ম) অপরে শিখাও' ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার এই অমৃতময় নির্দেশ গান্ধীজি মনে-প্রাণে অকপটে অনুসরণ করেছেন।

সমালোচনা (Criticism)

গান্ধীজি সম্মত সত্যাগ্রহের পথ অতি দুষ্কর পথ, সাধারণ মানুষের পক্ষে যা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে সমাজসেবাকেই একমাত্র লক্ষ্যবস্তু করা কেবল নিষ্কামকর্মযোগীর পক্ষেই সম্ভব। সাধারণ মানুষের বিষয়তৃষ্ণা, স্বার্থবুদ্ধি এমনই মজ্জাগত যে তাদের পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র সমাজসেবাকেই সে লক্ষ্যবস্তু করতে পারে না।

৩.৬. 'সর্বোদয় আদর্শ' সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণা
Gandhiji's conception of 'Sarvodaya Ideal'

খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেল-এর* নীতিধর্মমূলক একটি ছোট গল্পকে অবলম্বন করে ইংরেজ লেখক রাস্কিন 'আনটু দিস্ লাস্ট' (Unto this last —সর্বশেষ আগত ব্যক্তিটি) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি পাঠ করে গান্ধীজি এতই অভিভূত হন যে, গ্রন্থে প্রকাশিত নীতি ও ধর্মকে দেশবাসীর কাছে প্রচারের জন্য গুজরাটি ভাষায় সেটির অনুবাদ করেন এবং তাঁর সেই অনুবাদ গ্রন্থটির নামকরণ করেন 'সর্বোদয়'। **সর্বোদয় শব্দটির আক্ষরিক অর্থ, 'সবার উদয়' বা 'সবার কল্যাণসাধন'।**

বাইবেল-এর গল্পটি এ প্রকার ঃ

"জনৈক ব্যক্তি প্রত্যুষে কয়েকজন শ্রমিকের 'এক পেনি মজুরী চুক্তিতে' তাঁর আঙ্গুর ক্ষেতে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করেন। পরে, দ্বিপ্রহরে, অপরাহ্ণে এবং সন্ধ্যাকালে আর কিছু শ্রমিককে ঐ একই চুক্তিতে নিয়োগ করেন। রাত্রিকালে ঐ ব্যক্তি তাঁর কর্মচারীর মাধ্যমে প্রত্যেক শ্রমিককে এক পেনি করে মজুরী দেন। মজুরীর এ প্রকার সমবণ্টন-ব্যবস্থায় কিছু শ্রমিক, বিশেষত, প্রত্যুষের ও মধ্যাহ্নের নিযুক্ত কিছু শ্রমিক, অসন্তোষ প্রকাশ করায়

* Bible. সেন্ট মাথুজ অধ্যায় 20.

ক্ষেতের মালিক বলেন, 'চুক্তি অনুসারে প্রথম নিযুক্ত শ্রমিককে যেমন তাঁর প্রাপ্য দিয়েছি, 'সর্বশেষে নিযুক্ত শ্রমিককেও' (unto this last) সেই একই প্রাপ্য দিয়েছি— ন্যায়নীতি কোন ক্ষেত্রেই লঙ্ঘিত হয়নি'।"

বাইবেল-এর এই কাহিনীকে ভিত্তি করে রাস্কিনের 'আনটু দিস্ লাস্ট' গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য হল—**'প্রত্যেকের কাছ থেকে ততটুকুই (শ্রম) গ্রহণ করা যায় যতটা দিতে সে সমর্থ, এবং প্রত্যেককে ততটুকুই (সামগ্রী) দিতে হয় যতটা তার প্রয়োজন ; এটাই হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের নীতি'**। গান্ধীজি এই নীতিকেই 'সর্বোদয়-আদর্শ'রূপে নিজের জীবনে প্রয়োগ করেন এবং সমাজ-সংস্কারের মূলনীতিরূপে গ্রহণ করেন।

গান্ধীজি মূলত **সমাজ-সংস্কারক এবং 'সর্বোদয়-সমাজকেই' তিনি 'আদর্শ সমাজ' বলেছেন। সর্বোদয় সমাজই** গান্ধীজির 'রামরাজ্য'। সমাজজীবনে গান্ধীজি-সম্মত 'সর্বোদয়ের' সার কথা হল—যেহেতু সমগ্র জগৎ একই আত্মার (গান্ধীজি যাকে 'ভগবান'ও বলেছেন) বহিঃপ্রকাশ, মানুষে মানুষে প্রকৃত কোন বৈষম্য নেই। তবে, মানুষ মাত্রই একই আত্মার বিভিন্ন বিকাশ হলেও, আত্মার বিকাশ সব ক্ষেত্রে সমান হয় না, ক্ষেত্রভেদে কমবেশি হয়। যোগ্যতা ভেদে ব্যক্তি তার সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। যার যোগ্যতা বেশি সে অধিক পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, যার যোগ্যতা কম সে কম পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। **সমাজের এ প্রকার বৈষম্য-ব্যবস্থা সর্বোদয়ের আদর্শ থেকে বিচ্যুত।**

গান্ধীজির **সর্বোদয় আদর্শ অনুসারে, সমাজ-ব্যবস্থাকে এমন হতে হবে যেখানে কোন ব্যক্তি যেন তার** প্রয়োজনীয় সামগ্রী **থেকে বঞ্চিত না হয়।** সব মানুষেরই ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি দৈহিক চাহিদা আছে। এমন নয় যে, শক্তিমান, বুদ্ধিমান, ধনবান প্রভৃতি ব্যক্তির ক্ষুধা-তৃষ্ণা বেশি, আর দুর্বল, নির্বোধ ও নির্ধনের ক্ষুধাতৃষ্ণা অপেক্ষাকৃত কম। কাজেই, আদর্শ কল্যাণজনক সমাজ-ব্যবস্থাকে এমন হতে হবে যেখানে সমাজসেবী প্রত্যেক মানুষকে—স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, ইতর-ভদ্র, ধনী-নির্ধন, সবল-দুর্বল, জ্ঞানী-অজ্ঞানীর প্রত্যেককে—সাম্যদৃষ্টিতে গ্রহণ করা হয় এবং তারা প্রত্যেকে তাদের সাধ্যমতো শ্রম অনুসারে প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাভ করতে পারে। সত্য ও অহিংসাকে ভিত্তি করে এমন এক সমাজ গঠনই 'সর্বোদয়-সমাজ' যেখানে জাতপাত থাকবে না, বর্ণবিদ্বেষ থাকবে না, শোষণ নির্যাতন থাকবে না, যেখানে ব্যষ্টির ও সমষ্টির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথ উন্মুক্ত থাকবে। সকল মানুষের কল্যাণসাধনের নীতির ভিত্তিতেই গড়ে তুলতে হবে সমাজ ব্যবস্থা। প্রাচীন ভারতের মুনিঋষিরাও এমন এক আদর্শ সমাজের চিত্র অঙ্কন করে বলেছেন, 'সর্বে সুখিনঃ সন্তু' অর্থাৎ 'সবাই সুখী হোক্'। এমন এক পরিকল্পিত অহিংস সমাজব্যবস্থাকেই গান্ধীজি 'সর্বোদয় সমাজ' বলেছেন। **সব মানুষকে সাম্যদৃষ্টিতে গ্রহণ করে তাদের** প্রত্যেকের হিতসাধনই **হল গান্ধীজি-সম্মত সর্বোদয়ের সার কথা এবং সর্বোদয় প্রতিষ্ঠাই হল গান্ধীজি-সম্মত** স্বরাজ প্রতিষ্ঠা, **রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা।**

সর্বোদয় আদর্শের ব্যাখ্যায় গান্ধীজি **হিতবাদীদের** (utilitarians) 'সামাজিক আদর্শকে' গ্রহণ করেননি। বেন্থাম (Bentham), **মিল** (Mill) প্রভৃতি হিতবাদীদের মতে, 'সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক হিতই (সুখই) (greatest happiness of the greatest number) হচ্ছে প্রত্যেক সমাজের এবং সমাজস্থ ব্যক্তির পরমকাম্য। এই অভিমত অনুসারে যদি কোন কর্ম বা কর্মনীতির দ্বারা 'সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক হিত সাধনে' অল্প সংখ্যক লোকের অহিত হয়, তাহলেও সেই কর্ম বা কর্মনীতিকে 'সমাজকল্যাণসাধক' রূপে গণ্য করতে হবে। পুঁজিবাদ (Capitalism), গণতন্ত্রবাদ (Democracy) এমন কি সমাজতন্ত্রবাদেও (Socialism) 'সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক হিত'কে সমাজকল্যাণের আদর্শ রূপে গণ্য করা হয়। গান্ধীজি হিতবাদীদের এই আদর্শকে যথোচিত বলেননি। **সর্বোদয় আদর্শ, গান্ধীজির মতে, 'সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক হিত সাধন' নয়, তা হল 'সব** মানুষের সবরকম **হিত সাধন, সমান হিত সাধন'।**

ভগবদ্‌গীতার ভাবধারায় দীক্ষিত হয়ে এবং সাম্যদৃষ্টি গ্রহণ করে গান্ধীজি সব মানুষকে আত্মজনরূপে গ্রহণ করতে বলেন। **এ প্রকার সাম্যদৃষ্টিকে গান্ধীজি 'অনাসক্তিযোগ'* বলেছেন।** গান্ধীজি তাই বলেন— যে কল্যাণমূলক কর্ম বা কর্মনীতিতে সমাজের একজনেরও অহিত হয় তা প্রকৃতপক্ষে সমাজকল্যাণমূলক নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আত্মার সম্পর্ক, যেখানে একজনের অহিত হলে বাকি সকলেরই অহিত হয়। যে প্রকার কর্ম ও

* সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। ইক্ষতে যোগমুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শন'। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। ৬/২৯ (অর্থাৎ, যোগে সমাহিত চিত্ত, সর্বত্র সমদর্শী যোগীপুরুষ, নিজেকে সর্বভূতের মধ্যে এবং সর্বভূতকে নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন।)